BANGABHARATI - A National Research Journal of Bengali
ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

প্রাচীন চর্যাগীতিকা ঃ একটি পুণর্পাঠ ও ভাষা বিশ্লেষণ

ড. প্রকাশ কুমার মাইতি
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর প্রদেশ।

প্রবন্ধসার

চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক সাহিত্যিক নিদর্শনরূপে পণ্ডিত মহলে গৃহীত হয়েছে। আবার এ নিয়ে বিবাদের সীমানাও কম নয়। ফলত ভাষাচার্য থেকে শুরু করে উত্তরকালে বহুবিধ পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও ভাষিক দিক থেকে চর্যাপদকে দেখেছেন। বর্তমান আলোচনায় চর্যাপদের ভাষাকেন্দ্রিক আলোচনাই মুখ্য রূপ পেয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রতি ক্রমবিকাশের ভাষিক ধারাপথটি দেখার চেষ্টা হয়েছে এখানে। এছাড়াও চর্যাপদ বিষয়ে ধর্মীয় সাজুয্যের দিকটিও এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। সব মিলিয়ে বর্তমান আলোচনায় চর্যাপদ বিষয়ে একটি সামগ্রিক প্রতিরূপ ধরার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে, যা চর্যাপদের নিবিড় পাঠে সহায়ক হতে পারে।

ভূমিকা

হিন্দু তান্ত্রিক ধর্মের প্রতি বাঙালিদের একটা দুর্বলতা প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষিত হয়। ফলত, তন্ত্রাশ্রয়ী বৌদ্ধধর্মের প্রতিও বাঙালিদের ঝোঁক অস্বাভাবিক নয়। পল্লীবাংলায় এই ধর্মমতের অনুশীলন অনেক দিন ধরে ছিল বলে অনুমিত হয়। খ্রিঃ সপ্তম-অষ্টম শতকে পালযুগে এই চর্চা আরও ব্যাপ্ত হয়। কেননা, পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। পরবর্তীকালে সেনযুতা বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তার ঘটলে বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ীরা সামাজিকভাবে অনেকটাই কোন্ঠাসা ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাদি ক্রমশ বঙ্গদেশের বাইরে চলে যেতে থাকে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তির বিরোধিতা থেকে বাঁচবার তাগিদে তাঁরা প্রধানত আশ্রয় করলেন নেপাল ও তিব্বতকে। ১৯ শতকে একদল বাঙালি মণীষী এ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করলেন। ১৮৭৯ খ্রিঃ তিব্বতের পথ ধরে চীনে যান শ্রীশরৎচন্দ্র দাস। তিনি পিকিং-এর 'The Forbidden Temple' থেকে সংগ্রহ করেন বৌদ্ধতান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের চিত্র-প্রতীক। তিনি কলকাতায় ১৮৯২ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠা করেন 'Buddhist Text Society'। এইসময় B. H. Hodgson নেপাল থেকে একটি বৌদ্ধপুথি সংগ্রহ করেন। শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রের উদ্যোগে 'The Asiatic Society' থেকে ১৮৮১ খ্রিঃ এটি প্রকাশিত হয় 'Sanskrit Buddhist Texts of Nepal' নামে। এই সূত্রেই পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চারবার নেপাল যাত্রা করেন। তাঁর তৃতীয়বারের যাত্রায় (১৯০৭ খ্রিঃ) তিনি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থখানির সন্ধান পান। নেপালের রাজদরবার থেকে তিনি এটির নকল করে নিয়ে আসেন। পরে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে এটি প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এটির নাম দেন 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'। চর্যা ছাড়াওএতে আরও তিনটি গ্রন্থ সংকলিত ছিল। সেগুলি হল – (ক)সরোজবজ্রের সটীক দোহাকোষ, (খ) মেখলা টীকা সহ কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং (গ) বৌদ্ধতন্ত্রের পুথি ডাকার্ণব।

চর্যার গ্রন্থনামজনিত সমস্যা ঃ –

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাগীত সংকলনটির নাম দিয়েছিলেন 'চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' ।সুকুমার সেনের মতে এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'চর্য্যাশ্চর্য্য বিনিশ্চয়'। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য্য) এর নাম দেন 'আশ্চর্য চর্যাচয়'। তাঁর মতে, নির্মলগীরা টীকায় বস্তুনির্দেশক শ্লোকে এই নামটি উল্লিখিত আছে। প্রবোধচন্দ্র বাগচী এর নাম দেন 'চর্যাগীতিকোষ'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার প্রদত্ত নামটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, গ্রন্থটি

সিদ্ধাচার্যদের চর্য্য ও অচর্য্য অর্থাৎ আচরণীয় ও অনাচরণীয় কর্তব্যকর্ম নির্দেশক। বৌদ্ধপন্ডিত শান্তি ভিক্ষু শাস্ত্রী এই মতকে সমর্থনকরে বলেন – ''I see no justification to invent a new name when the old one conveys the better meaning, that is, Viniscaya 'determination' carya 'that to be praciced' and acarya 'that not to be practiced.'' [Preface, Caryagilikosa : Visva-Bharati]

আলোচ্য গ্রন্থটির সংস্কৃত টীকা রচনা করেন মুনিদত্ত। এই টীকা গ্রন্থের তিনি নাম দিয়ে ছিলেন 'চর্য্যাগীতিকোষ বৃত্তি'। এর তিব্বতী অনুবাদ করেন কীর্তিচন্দ্র বা চন্দ্রকীর্তি। আর সরাসরি মূলের তিব্বতী অনুবাদ করেন শীলচারী। তিব্বতী ভাষায় রচিত যে কোনো মূল গ্রন্থকে 'কাঞ্জুর' ও টীকা গ্রন্থগুলিকে 'তাঞ্জুর' বলা হয়। মুনিদত্তের গ্রন্থটি কর্দিয়ে সাহেব 'তাঞ্জুর' তালিকাভুক্ত করেছিলেন। সেখানে তিনি এটিকে 'চর্যাগীতিকোষ বৃত্তি' নাম উল্লেখ করেন। চর্যার সিদ্ধাচার্যদের রচিত গানের সংকলন এই গ্রন্থটি। এতে সাধকদের আচরণীয় বিধির উল্লেখ রয়েছে। সেই দিক থেকে 'চর্যাগীতিকোষ' নামটি বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা, এতে ব্যবহৃত তিনটি শব্দই যথাযথভাবে স্পষ্ট হয় এই নামের সূত্রে।

চর্যার রচনাকাল ঃ—

চর্যাগীতিকাগুলির রচনাকাল সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে পন্ডিতবর্গ নানা পন্থা, নানা পদ্ধতি অনুসরণ করলেও ঐক্যমত্য দূরঅস্ত। ড. সুকুমার সেনের মতে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংগৃহীত পুথির লিপিকাল খ্রিঃ পঞ্চদশ শতক হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা বেশি। তবে মূল গ্রন্থটির রচনাকাল তার অনেক পূর্ববর্তী হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথম চর্যাটির রচয়িতা লুইপাদ। তিব্বতি অনুবাদের মধ্য দিয়ে লুই-এর তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি হল – 'শ্রী ভগবদভিসময়', 'অভিসময়বিভঙ্গ' এবং 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকা দৃষ্টি নাম'। কথিত হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান লুই-এর দ্বিতীয় গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন। অর্থাৎ দীপঙ্কর লুই-এর সমসাময়িক বা কিছু কনিষ্ঠ হতে পারেন। দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রা করেন ১০৩৮ খ্রিঃ। সুতরাং লুই দশম শতকে জীবিত ছিলেন হবে অনুমান করা যেতে পারে।

তারানাথ দীপঙ্কেরের পাঁচজন শিষ্যের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলেন ভুসুকু। তিব্বতীয় চুরাশি সিদ্ধাচার্য-এর তালিকাতেও ভুসুকুর নামোল্লেখ রয়েছে। সেখানে তাঁকে শান্তিদেবের সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়েছে। শাক্যভিক্ষু স্থবির প্রথমগুপ্ত ১১০১ খ্রিঃ সরহের দোহাকোষের একটি পুথি নকল করেছিলেন। এর সংকলক ছিলেন পন্ডিত দিবাকর চন্দ। এই সূত্রে বলা যেতে পারে সরহ খ্রিঃ একাদশ-দ্বাদশ শতকে আবির্ভুত হয়েছিলেন।

শবরপাদের বেশকিছু রচনা তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া গেছে। 'সাধনমালা'য় দুটি, 'সিতকুরুকুল্লা সাধন'-এ একটি এবং 'বজ্রযোগিনী আরাধনবিধি'-তে একটি। 'সিতকুরুকুল্লাসাধন'-এর লিপিকাল ১১৬৫ খ্রিঃ। এই সূত্রে শবরপাদকে দ্বাদশ শতকে স্থাপন করা যেতে পারে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' (১২০৬খ্রিঃ) গ্রন্থে কঙ্কণের নামে একটি শ্লোক সংকলিত আছে। এই কঙ্কণ ও চর্যার কঙ্কণপাদ একই ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ যদি সত্য হয়, তবে ইনি দ্বাদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভুত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

ড. সুকুমার সেন-এর চর্যাগীতিকাগুলির রচনাকাল বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন না রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ। তাঁর মতে, আদি সিদ্ধাচার্য হলেন সরহ। ইনি শান্তি রক্ষিতের সমসাময়িক। এও জানা যায়, শান্তি রক্ষিত ভোট সম্রাট খি-স্রোঙ-দে চন-এর রাজত্বকালে (৭৫৫-৭৮০ খ্রিঃ) তিব্বতগমন করেন। শান্তি রক্ষিতের শিষ্য ছিলেন ধর্মকীর্তি। ইনি নালন্দার অধ্যাপক ছিলেন। ইনি সরহপাদেরও অধ্যাপক ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধর্মপালের রাজত্বকাল ৭৭০-৮১৫ খ্রিঃ। সরহের প্রশিষ্য ছিলেন শবরপাদ।

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

আর তাঁর শিষ্য ছিলেন লুই। কাজেই অষ্টম শতকের শেষভাগে লুই-এর জীবিত থাকবার সম্ভাবনা। রাহুল সংস্কৃত্যায়ণের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে চর্যাগীতিকাগুলির রচনাকাল অষ্টম শতক কিংবা তার পূর্ববর্তীও হওয়া সম্ভব।

চর্যাগীতিকাগুলির রচনাকাল বিষয়ে শহীদুল্লাহ-র মতামতটিও পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তাঁর মতে, আদি সিদ্ধাচার্য শবরপাদ। বৌদ্ধনাগ কাহিনী থেকে জানা যায়, শবরপাদ কমলশীল-এর জন্য দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। আবার এও জানা যায়, কমলশীল তিব্বতরাজ খি-স্রোঙ-দে চন -এর আহ্বানে তিব্বত যান ৭৬২ খ্রিঃ। সুতরাং শবরপাদ অষ্টম শতকের মাঝামাঝি জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

রাজা ইন্দ্রভূতির দীক্ষাগুরু ছিলেন কম্বলাম্বরপাদ। ইন্দ্রভূতির পালিত পুত্রের নাম ছিল পদ্মসম্ভব। এর জন্ম হয়েছিল ৭২১/৭২২ খ্রিঃ। সুতরাং কম্বলাম্বর পাদ খ্রিঃ অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন বলে অুমান করা যেতে পারে। চর্যার একটি টীকায় মীননাথের উল্লেখ আছে। ইনি মৎস্যেন্দ্রনাথ নামেও পরিচিত। মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খ্রিঃ নেপালে গিয়েছিলেন। সেই হিসেবে বলা যেতে পারে খ্রিঃ সপ্তম শতকের শেষ ভালে চর্যার রচনা শুরু হয়েছিল।

চর্যাগীতিকাগুলির রচনাকাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা কতকগুলি গ্রন্থের সাহায্য নিতে পারি। সেগুলি হল – 'Pag Sam Jon Jong' (সুম্পাখন্‌পো), 'Khabad Dun Dan' (লামা তারানাথ), 'Le Nepal, Vol-I' (Sylvan Levi), `Lamaism' (Waddel) প্রভৃতি। এই সমস্ত গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যাদির অনুসরণে বলা যায় যে, খ্রিঃ ৭ম-৮ম শতকে চর্যার রচনাকাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর এই ধারাটি খ্রিঃ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ব্যপ্ত ছিল।

চর্যার টীকা ও অনুবাদ ঃ

চর্যাগীতিকাগুলি যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে সাধকদের মধ্যে চর্চিত ছিল এবং নানা স্থানে এর চর্চা ব্যাপ্ত ছিল তাই এর নানা টীকা ও অনুবাদ রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। যেটুকু জানা যায় তা খুব সামান্য। চর্যার সর্বাপেক্ষা পরিচিত যে টীকাটির কথা আমাদের জ্ঞাত সেটি হল 'নির্মলগিরা'। সংস্কৃতে লেখা এই টীকাটির রচয়িতা হলেন মুনিদত্ত। 'নির্মলগিরা'-র একটি তিব্বতী টীকার কথা জানা যায়। যেটি রচনা করেছিলেন কীর্তিচন্দ্র বা চন্দ্র কীর্তি। মূলের থেকে তিব্বতীতে একটি সরাসরি অনুবাদের কথাও জানা যায়। এটি রচনা করেছিলেন শীলচারী। আরো কতকগুলি এই জাতীয় রচনার কথা জানা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান রচিত 'চর্যাগীতিবৃত্তি' এবং আর্যদেব রচিত 'চর্যামেলায়ন প্রদীপ'।

ছত্রসংখ্যা ও ভণিতা ঃ

চর্যা গানগুলির ছত্রসংখ্যা সাধারণর দশ। চল্লিশটি এমন গান পাওয়া গেছে। সংখ্যা অনুসারে এগুলি হল – ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯। চোদ্দ ছত্র বিশিষ্ট তিনটি গান পাওয়া যায়। এগুলির সংখ্যা হল – ১০, ২৮, ৫০। বারো ছত্রবিশিষ্ট দুটি গান পাওয়া যায়। এগুলির সংখ্যা হল – ২১, ২২। আট ছত্রবিশিষ্ট একটি মাত্র গান পাওয়া যায়। এর সংখ্যা হল – ৪৩।

জয়দেবের রচমনায় সাধারণত আট ছত্রবিশিষ্ট পদ বেশি পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীতে বারো বা চৌদ্দ ছত্রবিশিষ্ট পদ তুলনায় বেশি পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলী এবং জয়দেবের রচনায় সাধারণত দ্বিতীয় রচনাটি ধ্রুবপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি চর্যার অনুসৃতি বলেই মনে হয়। কেননা, চর্যার দ্বিতীয় ধ্রুবপদ। সমগ্র চর্যাগীতিকায় আট প্রকার ভনিতা ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে 'ভনই' সর্বাধিক উনিশবার ব্যবহৃত হয়েছে। সংখ্যা

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

অনুসারে এগুলি হল – ১, ৪, ৬, ৭, ১২, ২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৫, ৩৭,, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭। 'ভণন্তি' ব্যবহার হয়েছে তিনবার। সংখ্যা অনুসারে এগুলি হল – ৩, ১৬, ৩৯ (টীকাতে ভণই ব্যবহৃত)। বাকি ভণিতাগুলি নিম্নরূপ ঃ

ভণঅ – ২১নং
ভণথি – ২০ নং
বোলথি – ২৬ নং
গাইউ – ২, ২৮ নং
বুলথেউ – ১৫ নং
ভইঅ – ১১ নং
ভণতি – ২২ নং

ভণিতার ব্যবহার যে সবসময় অন্তিম চরণে হয়েছে এমন নয়। অন্য চরণেও ভনিতার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ভণিতা ব্যবহারের বৈচিত্র্য নিচে স্পষ্ট করা হল –

অন্ত্যচরণে ভণিতা – ৩, ৫, ৬, ৭, ১১, ১৬, ২১, ২২, ২৬, ৩২, ৩৮, ৪৬

উপান্ত্যচরণে ভণিতা – ১, ২, ৪, ১২, ১৫, ১৮, ২০, ২৭, ২৯, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৭

অন্যত্র ভণিতা – ২৬ (৪র্থ চরণ), ৪৫ (৪র্থ চরণ)

দুবার ভণিতা – ২৬

'ভণিতা' শব্দটি নেই, কিন্তু পদকর্তার নামোল্লেখ রয়েছে – ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪২, ৪৯, ৫০।

চর্যার সমকালীন রাষ্ট্রীয় চিত্র ঃ

গুপ্তযুগে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ক্রমশ তাতে ভাঙন দেখা দেয়। শুরু হয় শাক্ত আচার ও শৈব হঠযোগের চর্চা। যোগভ্রষ্ট সাধুদের হাতে জৈনধর্মের চর্চাও বিপথগামী হতে থাকে। অলৌকিক সিদ্ধি ও রতিকল্পের প্রতি ঝোঁক ক্রমশ বাড়তে থাকে। জৈন অলৌকিকতাবাদ ও শৈব হঠযোগের সম্মিলনে সৃষ্টি হয় শৈবনাথ পন্থ-এর। এই সময় বৌদ্ধধর্মও নানা শাখায় বিভক্ত ছিল। যথা, হীনযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। সহজসাধনা ছিল অনুত্তর সাধনা অর্থাৎ যার পর নেই। এটি অত্যন্ত উচ্চস্তরের সাধনা। যা সাধারণ সাধকের পক্ষে অসম্ভব। মধ্যযুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার সমভাবে হয়নি। এই দুটি অঞ্চলে ধর্মাচরণগত স্পষ্ট ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতের বৌদ্ধরা মূলত ছিলেন মহাযাপন্থী। পরে তাঁরা মাধ্যমিকবাদ, যোগাচার, বজ্রযান ও সহজযান পন্থায় বিশ্বাসী হন। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধরা মূলত ছিলেন হীনযানপন্থী।

অষ্টম শতকের মধ্যভাবে বাংলায় পাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা হয় গোপালের সিংহাসনলাভের মধ্য দিয়ে। পালরাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁরা 'সৌগত' বলেও প্রচার করতেন নিজেদের। তবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ছিল না। তাঁরা মূলত লোক সাধারণে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মমতকে পোষকতা দান করলেন। তাঁদের আনুকূল্যে উত্তর ভারতে মহাযান পন্থার প্রসার ঘটে।

পাল যুগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পেষণে এককালে যাঁরা চরম অবহেলিত ছিলেন সেই বর্ণ গৌরবহীন সাধারণ মানুষেরা, হিন্দু সমাজের একেবারে নিম্নবর্গে যাঁদের অবস্থান ছিল, তাঁরাও গুরুত্ব পেতে শুরু করলেন। পালযুগে এঁদেরই একটা বড়ো অংশ বৌদ্ধধর্মমতকে আশ্রয় করে ভিন্নতর সাধনপথের অনুসারী হয়ে উঠলেন। তার ফলে ডোম্বী, শবর প্রভৃতি জনজাতির মানুষও চর্যায় জায়গা পেয়ে গেলেন। তবে ব্রাহ্মণ ধর্মগুরুদের কতখানি সম্মান তারা পেয়েছিলেন এ বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। এর প্রমাণ চর্যায় বেশকিছু জায়গায় স্পষ্ট।

তিব্বত ও চীনের সঙ্গে এই সময় ধর্মীয় সংযোগ দৃঢ়তর হয়। খ্রিঃপূঃ প্রথম শতক থেকে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। তবে খ্রিঃ পঞ্চম শতকে কুমারজীবের সময় থেকে তা ব্যাপকতা লাভ করে।

এই সময় থেকে তিব্বত ও চীন বৌদ্ধধর্ম চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হয়। ভারতবর্ষে পালযুগের পরে পুনরায় হিন্দুধর্মের উত্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও চর্চা অনেকটাই সীমিত হয়ে ওঠে।

চর্যার ধর্মমত ঃ—

চর্যাসাধকদের লক্ষ্য হল সহজমহাসুখ প্রাপ্তি। তাঁদের কাছে এটিই পরমবস্তু বা পরমার্থ। অনেকেই বৌদ্ধদের নির্বাণলাভের সঙ্গে এর তুলনা করেন। 'নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা' (ধম্মপদ-১৮৪)। সহজমহাসুখের অন্যনাম 'সহজানন্দ'। সহজসাধকদের পরম কাঙিক্ষতে বিষয় এটি। ৭নং চর্যায় একে বলা হয়েছে 'জিনউর'। ৯ নং চর্যায় বলা হয়েছে 'আনুতুধাম'। ৫০ নং চর্যা বলা হয়েছে 'জোহ্নবাড়ী'।

সহজানন্দ একটি অচিন্ত্য মহাসুখকর অনুভব। পার্থিব জগতে নর-নারীর মিলনগত যে আনন্দ তার কোটিগুণিত আনন্দ হল সহজ মহাসুখ। মুণিদত্ত বলেছেন, পরিপক্ক ও কুশল যোগীরা 'যুগনদ্ধরূপ সহজানন্দ' ফল অন্বেষণ করেন। 'যুগনন্ধ' কথাটির অর্থ হল দুই তত্ত্বের একীভূতরূপ। এই দুটি তত্ত্ব হল – 'প্রজ্ঞা-উপায়' বা 'শূন্যতা-করুণা।' এর মধ্যে উপায় বা করুণা হল পুরুষতত্ত্ব; এবং প্রজ্ঞা বা শূন্যতা হল স্ত্রীতত্ত্ব। 'উপায়' বা 'করুণা'কে আবার তুলনা করা হয়েছে 'ভুজঙ্গ' বা 'প্রেমিক' -এর সঙ্গে ; যা প্রকাশ করে 'হ' বর্ণ। আর 'প্রজ্ঞা' বা 'শূন্যতা'কে তুলনা করা হয়েছে 'দারী' বা 'প্রেমিকা'-র সঙ্গে; যা প্রকাশ করে 'স' বর্ণ। এই দুইয়ের প্রণয়মিলন বা মহারাগের ফল হল সহজানন্দ বা সহজমহাসুখ। 'সহজ' শব্দটি আসলে হল 'স-হ-জ'। এর অর্থ হল 'স' ও 'হ'-এর মিলনগত ফল। এটিই হল চর্যার পরমতত্ত্ব। জগৎ সংসারেই-এর উৎপত্তি। তন্ত্রমতে, এই সহজই স্বরূপ। এই সহজই সর্বজগৎ। বিশুদ্ধ চিতে এর অনুভবই নির্বাণ।

সহজানন্দের চারটি স্তর। এগুলি আসলে চারটি 'ক্ষণ'-এ চারটি আনন্দ। প্রথমটি হল 'বিচিত্রক্ষণ', যা প্রকাশ করে 'প্রথমানন্দ' বা 'আনন্দ'-কে। দ্বিতীয়টি হল 'বিপাকক্ষণ', যা প্রকাশ করে 'পরমানন্দ'-কে।তৃতীয়টি হল 'বিমর্দক্ষণ', যা প্রকাশ করে 'বিরমানন্দ'-কে। চতুর্থটি হল 'বিলক্ষণক্ষণ', যা প্রকাশ করে 'সহজানন্দ'-কে।

অন্যভাবে বিষয়টিকে দেখানো যেতে পারে এই রূপে ঃ 'প্রথমানন্দ' হল 'ভব'।

'পরমানন্দ' হল 'নির্বাণ'।

'বিরমানন্দ' হল 'মধ্যমানন্দ মাত্রস্তু'।

'সহজানন্দ' হল পূর্বোক্ত ত্রিস্বভাববর্জিত এক অতীন্দ্রিয় মহাসুখ।

সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত এই 'সহজানন্দ' এমন এক অবস্থা যেখানে রাগ-বিরাগ 'মধ্যমানন্দ' কোনো কিছুই নেই। শুধু আছে সর্বাবিবর্জিত সহজাখ্য নিস্তরঙ্গ আনন্দ। তাই সহজ মহাসুখের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চর্যাকারেরা বলেছেন, সহজ মহাসুখ হল পার্থিব চেতনার অতিরিক্ত এক অনির্বচনীয় মহাবিহ্বল তুরীয়ানন্দ। এটি প্রজ্ঞা ও উপায় কিংবা শূন্যতা ও করুণার মিলিত রূপের ফলজাত এক প্রকার অপার্থিব আনন্দ, যা সহজ (Inborn) এবং নিত্য (External)। এর সৃষ্টি নেই, বিনাশ নেই, ভবচক্রে আবর্তন নেই। এ কোনো কার্যকারণের অধীন নয়। কিংবা হেতু প্রত্যয়ের ফলও নয়। এ আনন্দ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবের অতীত বিষয়। যার অনুভব ক্ষণে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিনষ্টি ঘটে।

বৌদ্ধধর্মের মূল বীজ হল শূন্যতা বা নৈরাত্ম। এই শূন্যতার বোধ চরমতা প্রাপ্ত হয়েছিল মাধ্যমিক শাস্ত্রে। তাতে বলা হয়েছিল –

সদ নেই।
অসদ নেই
সদসদ নেই।
সদসদ আছে বা নেই এই বোধটাও নেই।

তাই এই বোধকে তুলনা করা যেতে পারে সর্বাত্মক নাস্তিবাদ বা uncompromising sprit of negation-এর সঙ্গে। কেননা, এর কোনো রূপ

নেই, দ্রষ্টা নেই, শব্দ নেই, শ্রোতা নেই, গন্ধ নেই, ঘ্রাতা নেই, রস নেই, স্পর্শ নেই, স্পর্শকারী বা স্প্রষ্টা নেই, চিত্ত নেই, চৈত্তিক নেই।

কায়, বাক ও চিত্তের সংযোগ তৈরি হয় মানুষের সত্তাবোধ। সর্বশূন্যতায় পৌঁছাতে গেলে কায়, বাক ও চিত্তের শূন্য করতে হয়। সাধকদের মতে, এই তিনটি স্তর অতিক্রম করেই সর্বশূন্যতায় পৌঁছানো যায়। প্রথম তিন শূন্য নিম্নমানের শূন্য। এই তিনটি শূন্যকে অতিক্রম করেই চতুর্থ শূন্যে পৌঁছানো যায়। চর্যায় প্রথম দুই শূন্যকে কোথাও কোথাও চন্দ্র এবং সূর্যও বলা হয়েছে। আর এই দুয়ের শূন্যতাবোধের মধ্য দিয়েই তৃতীয় শূন্যতার উপলব্ধির সূচনা হয়। তৃতীয় শূন্যের অপর নাম হল 'পুলিংদা'। আর চতুর্থ শূন্য হল 'জিনপুর' – যা সাধকের পরম আকাঙক্ষার ধন। যার অবস্থান সবার উচ্চে।

সহজ মহাসুখ কোনো সর্বাত্মক নাস্তিবাদ (Nihilism) নয়। এর মধ্যে এক প্রকার ভাবাত্মক অবস্থার স্বীকৃতিও রয়েছে। জীবন আছে, কিন্তু তা মৃতব্য। চিত্ত আছে, কিন্তু সে চিত্ত অচিন্তবৎ। মন আছে, কিন্তু তা অ-মনবৎ। এই রূপেই অ-ভাবের মধ্য দিয়ে ভাবের স্বীকৃতি প্রকটিত হচ্ছে।

চর্যার সাধনক্রম ঃ—

চর্যার সাধকেরা একটি নির্দিষ্ট সাধন পদ্ধতি ও সাধনক্রম অনুসরণ করতেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল সহজমহাসুখলাভ। কিন্তু গুহ্য এবং প্রায় অপ্রাপ্য এই বিষয়টিকে অনুভব করবার জন্য নানাবিধ ক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক প্রকরণ আচরিত হত। বিষয়টি নিম্নরূপ ঃ

ক) প্রজ্ঞা ও উপায়যোগ এবং সপ্রপঞ্চ চর্যা
প্রজ্ঞা ও উপায়-এর সংযোগে সাধক সহজানন্দলাভের পথে অগ্রসরমান হন।

খ) চিত্ত-বিশোধন
প্রজ্ঞা ও উপায় যোগে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় তা সংসার চিত্ত (শৃগাল চিত্ত)। এই চিত্ত সংবৃত্ত, চঞ্চল ও মলাবৃত। কাজেই এই চিত্তের বিশোধন প্রয়োজন।

গ) চন্দ্রার্ক গতি ভঞ্জন
চিত্তকে মধ্যমাতে প্রবেশ করাতে গেলে চন্দ্র-সূর্যের গতি ভঞ্জন করতে হয়। তবেই অবধূতি মার্গে যাত্রা সম্ভব।

ঘ) কপালচর্যা বা নিরংশু চর্যা
অবধূতি প্রবেশের আগে কপালচর্যা একটি অবশ্য আচরণীয় বিধি। 'কপাল' শব্দের অর্থ অস্থি আবরণ। অবধূতী যোগিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সাধকের প্রস্তুতিই হল কপালচর্যা।

ঙ) অবধূতী প্রবেশ সহজসাধনার তৃতীয় স্তরে চিত্তকে অবধূতী মার্গে প্রবেশ করানো হয়। এটি ধর্মকায়কেন্দ্রিক। এতে ১৬০ প্রকার প্রকৃতি দোষ আছে। এর মধ্যে হৃদয় দোষ তত, বাকদোষ ৪০টি এবং চিত্ত দোষ ৭টি। দিবা এবং রাত্রি ভেদে দ্বিগুণিত হয়। যেহেতু এর মধ্যে ১৬০ প্রকার দোষ বর্তমান তাই একে সর্বশূন্য বলা যায় না।

চ) প্রবাহাভ্যাস অবধূতী মার্গের চিত্তকে বলা হয় বজ্রচিত্ত। কিন্তু তা-ও স্ব-অধিষ্ঠান। একেই সাধক ক্রমশ প্রভাস্বরের দিকে চালিত করেন।

ছ) অবধূতী মার্গের ফল বা পঞ্চাকার সম্বোধি অবধূতী মার্গে চিত্ত উর্ব্ধপথে প্রবাহিত হওয়ায় বজ্রচিত্ত প্রায় নির্বিকল্প অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পঞ্চতথাগতকে সহায় করে জ্ঞানমুদ্রার সঙ্গে মিলন ঘটে সাধকের। অবধূতী মার্গে নানা নিমিত্ত দর্শন ঘটে। যথা, মরীচিকাকার, ধূম্রাকার, খদ্যোতাকার, উজ্জ্বলদীপ এবং অনির্বাণ আলো। এই কারণে অবধূতী মার্গের অন্তরাভববিজ্ঞান বা নিমিত্তদর্শন নামেও পরিচিত।

জ) চন্ডালী প্রজ্জ্বলন অবধূতীর জ্যোতি স্বয়ং জ্যোতি নয় (Self effulgent নয়)। এ প্রতিভাস মাত্র। অবধূতীর শূন্যতা সম্বোধি মায়া-স্বপ্ন সদৃশ। এতে মূত্র নাড়ী, শুক্রনাড়ী, বিট নাড়ী, ললনা-রসনা নাড়ী, নয় প্রকার বায়ু এবং ইন্দ্রিয়ের শাসন দগ্ধ

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

হয়। ইন্দ্রিয়জ অহং বিনষ্ট হয়। প্রজ্জ্বলিত হয় ইন্দ্রিয়াতীত অহং।

ঝ) প্রভাস্বর গগন-সমুদ্র বা মহাসুখচক্র চণ্ডালী প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে চিত্ত প্রভাস্বর গগন-সমুদ্রে প্রবেশ করে। এই স্তরে কোনো ক্রিয়া নেই। আছে শুধু অনুস্মৃতি ও সমাধির সংবেদন।

ঞ) মহাসুখের সংবেদন সাধনার অন্তিমক্রমে সহজ মহাসুখের সংবেদন সৃষ্টি হয়। এ হল সর্বশূন্যতার বোধ। এ বোধ অচিন্ত্য এবং বাকপথাতীত। এখানে অন্ধকার নেই, নিমিত্তদর্শন নেই, মায়াদর্শন নেই। আছে কেবল স্বয়ংপ্রভ প্রভাস্বর জ্যোতির স্বসংবেদন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চর্যার তিনটি প্রধান নাড়ীর উল্লেখ করা হয়েছে। বামা নাড়ী হল ললনা, এটি স্ত্রীবাচক। দক্ষিণ নাড়ী হল রসনা, এটি পুরুষবাচক। মধ্যমা হল নপুংসক। এটিই অবধূতিকা বা অবধূতী। রসনায় প্রথমানন্দের অনুসূতি। ললনা-য় পরমানন্দের অনুভূতি। এই আনন্দ যখন অবধূতী মার্গে প্রবেশ করে তখন তা হয় বিরমানন্দ। এটি প্রথম অনুভূত হয় নাভিতে। তারপর কণ্ঠে, তারপর হৃদয়ে এর অনুভব। এবং সবশেষে সহজানন্দ রূপে অনুভূত হয় উষ্ণীষে। চিত্রাকারে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে এইভাবে—

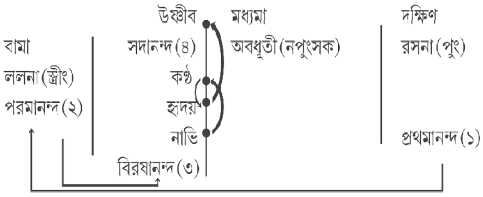

চর্যার ভাষা ঃ-

চর্যাগীতিকাগুলির রচনাকাল যেহেতু খ্রিঃ ৭ম-৮ম শতক থেকে হতে পারে বলে অনুমান করা হয়, তাই বলা যেতে পারে যে, চর্যায় ব্যবহৃত ভাষা বাংলা ভাষার একেবারে প্রথম স্তরের পরিচয় বহন করে। অপভ্রংশ অবহট্টের ব্যবহার তখনও হচ্ছে। কেননা, পরবর্তীকালে বিদোপতির রচনাতেও অবহট্টের ব্যবহার রয়েছে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে চর্যার বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন এটি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। তবে এতে শৌরসেনী অপভ্রংশ ও মৈথিলীর কিছুকিছু প্রভাব রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই সূত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে, অন্যান্য প্রাদেশিক অপর পক্ষ থেকেও চর্যাকে তাদের ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলে দাবি করা হয়। তবে তা নেহাতই বল প্রকাশের প্রচেষ্টামাত্র। সুনীতিকুমার নানা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন চর্যার ভাষা বাংলা-ই।

ধ্বনি ও রূপগত বৈশিষ্ট ঃ-

ক) হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর ব্যবহারে শিথিলতা —
চী (৯), চিএ (৪০)
হোহী (৫), হোহি (৪২)
কুলে, কূল (১৪), কূলে, কুল (১৫)

খ) জ/য়, ণ/ন, শ/ষ/ম-এর ব্যবহারে শিথিলতা —
যাই (১০), জাই (৪২)
নাবী (৮), ণাবী (১৩)
শবর (১৩) সবর (২৮)
শূন (১৩), সুণ (১৩)
ষিয়ালা (৩৩), শিআলা (৫০)
ষহজে (২৭), সহজে (৪২)

গ) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব-এর ব্যবহার —

নিঅড্ডী (৫)	— নিঅড়ী
রত্তো (১৯)	— রত
চ্ছাড়ী (১৭)	— ছাড়ী
চ্ছিনালী (১৮)	— ছিনালী

ঘ) সন্ধি নিষ্পন্ন শব্দের ব্যবহার —

অজরামর (৩)	— অজর+অমর
ভাবাভাব (৯)	— ভাব+অভাব

বিরমানন্দ (২৭) — বিরম+আনন্দ

ঙ) বাংলা প্রত্যয় যোগে শব্দগঠন —

চোরে (২) — চোর+এ

ঘরে (২) — ঘর+এ

ঘড়ুলী (৩) — ঘড়্+উলী

গঅণন্ত — গঅন+অন্ত

চ) এক কারকে অন্য কারকের বিভক্তি এবং 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ —

কর্তৃ — চোরে নিল (২), কুম্ভীরে খাঅ (২)

কর্ম — সহজে থির করী (৩), গঅবরে তোলিআ (১২)

করণ — কুঠারে ছিজঅ (৪৫), সমতা জোএঁ জলিঅ চন্ডালী (৪৭)

সম্প্রদান — ধামার্থে (৫), কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিলা (১৯)

অপাদান — দশবল রঅণ হরিঅ দসদিসেঁ (৯), জামে কাম কি কামে জাম (২২)

অধিকরণ — ঘরে সান্ধঅ (৩), কুন্দুরে ধীরা (৪)

ছ) সর্বনামের বাক্যালঙ্কার রূপে প্রয়োগ —

এক সে শুণ্ডিনা (৩)

এক সো পদুমা (১০)

গুরু বোব সে সীমা কাল (৪০)

জ) বাংলা উপসর্গের ব্যবহার —

বিআলী - বি+আলী (৪), বিমনা (৭), বিখলা (৩৯)

নিসারা — নি+সারা (৩)

সুচ্ছড়ে — সু+চ্ছড়ে (১৪)

ঝ) যৌগিক বা সংযোগমূলক ক্রিয়ার ব্যবহার -

ধরণ ন জাই (২)

নিদ গেল (২)

ছই ছোই যাই (১০)

গুণিআ লেহু (১২)

দায় লেহুঁ (১২)

কহণ না জাই (২০)

ভান্তি ন বাসসি (১৫)

টলি পইসই (৩১)

ঞ) ছোট ছোট সরল বাক্যের ব্যবহার —

ছোরে নিল (২)

চলিল কাহ্ন (১৩)

পঞ্চনালেঁ উঠি গেল পাণী (৪৭)

ট) বাক্যে ক্রিয়াহীনতা (বাংলা বাক্যের বিশিষ্ট লক্ষণ) —

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল (১)

দড় গই সঅল সহাবে সুধ (৯)

ঠ) কর্তৃ-কর্মবাচ্যের ব্যবহার —

ডমরু বাজএ বীর নাদেঁ (১১)

অধরাতি ভব কমল বিকসি উ (২০)

নানা তরুবর মৌলিল রে (২৮)

চর্যার ভাষার সঙ্গে আদিমধ্য বাংলা ভাষার কিছু সাদৃশ্য ও তুলনা —

আ) অপণা মাংসে হরিণা বৈরী (চর্যা ৬)

আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

আ) হাথেরে কাঙ্গাণ মা লোউ দাপণ (চর্যা ৩২)

হাতক কঙ্কণ কি এ দরপণে হেরিয়ে (গোবিন্দ দাস)

হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাহি খুঁজি (ঘনরাম)

ই) খেলই বহুবিহ খেড়া (চর্যা ৪১)

চোর রাজা খেড়ি খেলে দেব বনমালী (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)

খেড়ি খেলাইএ আহ্মে নান্দের ঘরে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

ঈ) জঅ জঅ দুন্দুহি-সাদ উচ্ছলি আঁ।
কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিলা।। (চর্যা ১৯)
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্বদিকে উঠিল মঙ্গল জয় জয়।।
(বৃন্দাবন দাস)

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

চর্যায় ব্যবহৃত দেশি শব্দ —

চর্যা১	ঃ	ডাল
চর্যা২	ঃ	দুলি, বিআতী
চর্যা৩	ঃ	ঘড়ুলী, নিসারা
চর্যা৪	ঃ	কোঞ্চা তাল, কুন্দুর
চর্যা৫	ঃ	চিখিল, টাঙ্গী, নিঅড্ডি
চর্যা৬	ঃ	ডাক
চর্যা৭	ঃ	নিঅড়ী
চর্যা৮	ঃ	খুনি□কাচ্ছি, কেডুআল
চর্যা৯	ঃ	বাখোড়
চর্যা১০	ঃ	ডোম্বী, কুড়িআ, পাখুড়ী, বাপুড়ী, চাঙ্গাড়া
চর্যা১২	ঃ	কোঠা, বড়িআ
চর্যা১৪	ঃ	কবড়ী
চর্যা১৫	ঃ	খাট, খড়, তড়ি
চর্যা১৯	ঃ	খম্ভা, টাকলা, জাল
চর্যা১৮	ঃ	চ্ছিনালী
চর্যা২০	ঃ	বিআণ, বায়ূড়া
চর্যা২৩	ঃ	বিহণি
চর্যা২৮	ঃ	খাট, তাবোলা
চর্যা৩৩	ঃ	হাড়ী, বেং□পিটা
চর্যা৩৮	ঃ	ণাবড়ী খন্ডী
চর্যা৪১	ঃ	বোড়ো
চর্যা৪২	ঃ	নড়
চর্যা৪৪	ঃ	কলএল
চর্যা৪৭	ঃ	চন্ডালী
চর্যা৪৯	ঃ	বঙ্গাল, চন্ডাল
চর্যা৫০	ঃ	বাড়হী, কুরাঢ়ী

চর্যায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দ —

চর্যা১	ঃ	চঞ্চল, পঞ্চ, কাল, গুরু, করণ
চর্যা২	ঃ	চর্যা
চর্যা৩	ঃ	এক, গুন্ডিণী, বারুণী, দশমী, চিহ্ন
চর্যা৪	ঃ	ধীর, নারী, চীর
চর্যা৫	ঃ	গম্ভীর, বাম
চর্যা৬	ঃ	মাংস, হরিণা, হরিণী, বৈরী
চর্যা৭	ঃ	নিবাস, ভব, পরিচ্ছিন্না
চর্যা৮	ঃ	করুণা, মহাসুখ
চর্যা৯	ঃ	দশ, তথা
চর্যা১০	ঃ	নগর, সম
চর্যা১১	ঃ	দেহ, চরণ, রাগ, পরম
চর্যা১২	ঃ	নঅবল
চর্যা১৩	ঃ	কুমারী, দেহ, তরঙ্গ
চর্যা১৪	ঃ	গঙ্গা, মাতঙ্গী, সংহার
চর্যা১৬	ঃ	ভয়ংকর, নিরন্তর, চিত্ত, নায়ক
চর্যা১৭	ঃ	অবধূতী, বীণা
চর্যা১৮	ঃ	অন্ত, কণ্ঠ
চর্যা১৯	ঃ	ভব, উন্মত্ত
চর্যা২০	ঃ	মূল
চর্যা২১	ঃ	নাশ
চর্যা২২	ঃ	অচিন্ত, মরণ, রণ, ধাম
চর্যা২৬	ঃ	বাল, কারণ
চর্যা২৭	ঃ	কমল, অঙ্গ, কমলিনি, বুধ, বিলক্ষণ
চর্যা২৮	ঃ	বালী, ভুজঙ্গ, পরশ, সন্ধি
চর্যা২৯	ঃ	ভাব, অভাব, আগম, উদক্ত
চর্যা৩০	ঃ	নিরন্তর, বিশুদ্ধি, অন্ধকার
চর্যা৩১	ঃ	করুণা, কান্তি, আচার
চর্যা৩২	ঃ	নাদ, বিন্দু, রবি
চর্যা৩৩	ঃ	সংস্কার, চৌর, গীত, বিরল
চর্যা৩৪	ঃ	বাক, অলক্ষ্য, পরম, দ্বাদশ

চর্যা৩৫	ঃ	মোহ, সর্ব, পাপ
চর্যা৩৬	ঃ	তথতা, সহজ (সহজাত)
চর্যা৩৭	ঃ	অনুভব, অবকাশ, মা (না-সূচক)
চর্যা৩৮	ঃ	নৌ, কূল
চর্যা৩৯	ঃ	জায়া
চর্যা৪০	ঃ	আগম, বাক
চর্যা৪১	ঃ	মূঢ়া
চর্যা৪২	ঃ	সহজ, ভাব
চর্যা৪৩	ঃ	সমরস
চর্যা৪৪	ঃ	সর্ব, ধাম
চর্যা৪৫	ঃ	তরু, মূঢ়, মূল
চর্যা৪৬	ঃ	স্বভাব
চর্যা৪৭	ঃ	সমতা, পঞ্চ
চর্যা৪৯	ঃ	পথও, পরিবার, বিশেষ, দেশ
চর্যা৫০	ঃ	খ-সম, আকাশ

সমাসবদ্ধপদের ব্যবহার—

কমল-কুলিশ (৪, ৪৭)
কমল রস (৪)
পারগামী, মোহতরু (৫)
ভব পরিচ্ছিন্না (৭)
সদগুরু (৮)
ভাবাভাব (৯)
নাড়িশক্তি, বীরনাদ, রবিশশিকুন্ডল, দেহ-নঅরী (১১)
করুণা পিহাড়ি, সদগুরু (১৭)
তিশরণী ণারী, ভবজলধি, মাঅবজাল, চিঅকগুহার (১৩)
গঅণ দুখোলেঁ (১৪)
মাআমোহা-সমুদা, জলপথ (১৫)
মহারস, তিহুঅন, খররবি কিরণ-সন্তাপে, গঅণাঙ্গণ (১৬)
সমরস, বুদ্ধনাটক (১৭)
বিদ্বজন-লোঅ, কামচন্ডালী (১৮)
সহজ-উন্মনো (১৯)
উঞ্চল-পাঞ্চাল, সদগুরু গেছে (১৯)
ভবনির্বাণা, অজরামর (২১)
পঞ্চজণা, নলণীবন, পদ্মবণ, মাআজাল, মাআহরিণী (২৩)
বিরমানন্দ, সহজানন্দ, মহাসুহ (২৭)
সহজসুন্দারী, কর্ণ কুন্ডল বজ্রধারী, তিঅ-ধাউ, গুরুবাক, শরসন্ধানী গিরিবর-সিহর (২৮)
তিঅ-ধাএ,উদক-চান্দ (২৯)
করুণ-মেহ, গঅণ-মাঝেঁ, বিসঅ-বিশুদ্ধিঁ (৩০)
ইন্দিঅবণ, করুণা-ডমরুলি (৩১)
চিঅরাজ, নিঅমণ (৩২)
সুনকরুণরি, অভিন-চারেঁ, কাঅবাকচিঅ, মহসুহলীনে, পরমনিবাণেঁ, স্বপরাপর, সঅবানুত্তর (৩৪)
মোহভান্ডার, সপরবিভাগা (৩৬)
বাকপথাতীত (৩৭)
সদগুরুবঅণে (৩৮)
গুরুবঅণ, জলবিম্বাকারে (৩৯)
মণগোএর, বাকপথাতীত, জিণবঅণ (৪০)
রাজসাপ, মরুমরীচী-গন্ধ, দাপতিবিম্বু, বাংধি-সুআ (৪১)
কান্ধবিয়োএ, অনুদিন, ভাগতরঙ্গ (৪২)
সহজমহাতরু, খসম সভাবে, মণবঅণা, সমরসে, ভাগভাব (৪৩)
সকল-ধাম, কলএল-সাঁদে (৪৪)
বরগুরুবঅণে, সুভাসুভ, জো-তরু-দেব (৪৫)
তথতাস্বভাবে (৪৬)
কমলকুলিশ, সমতা-জোএঁ, মেরু শিখর, হরি-হর-বান্ধা, পঞ্চনালে (৪৭)
বাজণাব, অদয় দঙ্গালে, নিঅ হরিণী,

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

মহানেহে, চউ-কোড়িভাণ্ডার (৪৯)
মাআ-মোহা, শবরাশবরি, দহ-দিহে, অনুদিন, ভবমতা (৫০)

অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার –

নিচিত (১), সুসুরা (২), গরাহক (৩) বিআপক, অহিলেসে (৯), পরাণ (১০), পরস (১৩), চান্দ সুজ্জু, পান্তর (১৫), নিবাণ (২৮), পিরিচ্ছা (ওপৃচ্ছা) (২৯), স্বপনে (৩৬), মুদেরী (ওমুদ্রা) (৩৭), সুঅর্ণ (৪৬), নিরেবণ (৫০)।

তদ্ভব শব্দের ব্যবহার –

বিশেষ্য – ছান্দ, বান্ধ, পাখ, চোর, রাতি, বাকল, দুয়ার, আগ, আখি, কাজ, জাম, কাম, সেজ প্রভৃতি

বিশেষণ – সুনা (শূন্য), মাতা, (মত্ত), সাচ, মিচ্ছা, নিবুধি, নিদালু, নাঙ্গা, দুধ্য, অদঅ,লোনহা প্রভৃতি।

সর্বনাম – মই, মোক, মোর, তু, তোরেঁ, তোরা, সে, তা, অপণা, কেহো, কোহো প্রভৃতি।

কারক বিভক্তি –

ক) কর্তৃকারক
শূন্যবিভক্তি – লুই ভণই
'এ' বিভক্তি – কুম্ভীরে খাঅ
'আ' বিভক্তি – গ এন্দা <গজেন্দ্র

খ) কর্মকারক
শূন্যবিভক্তি – গুরু পুচ্ছিঅ জান
'এ' বিভক্তি – বিদ্ধহ পরম নিবাণেঁ
'ক' বিভক্তি – মোক, ঠাকুরক
'রে' বিভক্তি – তোরে

গ) করণ কারক
'এ' বিভক্তি – করহ কলে চিপিউ

ঘ) সম্প্রদান কারক
'এ' বিভক্তি – অপণা মাংসে হরিণা বৈরী

ঙ) অপাদান কারক
'এ' বিভক্তি – মণিমূলে বহিআ

চ) সম্বন্ধপদ
'র' বিভক্তি – মুসার, বাড়ির
'এর' বিভক্তি – রুখের, কপাটের
'ক' বিভক্তি – ছান্দক

ছ) অধিকরণ কারক
'ত' বিভক্তি – সাঙ্কমত, বাটত, পিটত, হাড়ীত
'এ' বিভক্তি – ঘরে, রথে, বেনে□

অনুসর্গের ব্যবহার –

বিনু, বিহূনে, পাখ (<পক্ষ), সম, সাঙ্গে, উ্বেসেঁ (<উদ্দেশ্যে), অন্তরে (<তরে/জন্য), লাগি, আগলি, মাঝে ইত্যাদি।

লিঙ্গ প্রয়োগে বিশিষ্টতা –

বাংলা ভাষায় লিঙ্গ-অনুসারে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তন হয় না। সংস্কৃত কিংবা উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলিতে (যথা, হিন্দি) এর প্রয়োগ কঠোর ভাবে হয়। চর্যায় দু' একটি ক্ষেত্রে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, চর্যা নং ১০-এ পাই 'তোহোরি কুড়িআ, হাড়েরি মালী'। কিংবা ২৮ নং চর্যায় পাই – 'রাতি পোহাইলী'। ই/ঈ বা নি /ণী যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগঠিত হতে দেখা যায়। যেমন, বালী/বালি, দেবী, হরিণী, ডোম্বী প্রভৃতি। পুংলিঙ্গবাচক শব্দগঠনের জন্য 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হতে দেখা যায়। যথা, হরিণা, শবরা ইত্যাদি।

সমাসনিষ্পন্ন শব্দের ব্যবহার –

দ্বন্দ্ব – চান্দ যুজু (৮), বামদাহিন (৮)
তৎপুরুষ – কমলরস (৫),
আসবমাতা (৯)
কর্মধারয় – ভাগতরঙ্গ (৪২), মহামুহ (১)
বহুব্রীহি – যমণ ভতারি (২০), অলক্খলক্ণচিত্তা (৩৫)
রূপকসমাস – ভবণই (৪),

ভবজলধি (১৩)

ক্রিয়ার রূপ গঠনে ব্যবহৃত নানাপ্রকার কালবিভক্তি –

ক) বর্তমান কাল
মি, ম, হুঁই, এ, মি, ই, অ, এ, অই, আই, অস্তি, অতি, অথি।

খ) অতীতকাল
অ, আ, উ, ও, ড়, ল, লা, লী

গ) ভবিষ্যৎ কাল
ব, বে, বি

অসমাপিকার গঠন ঃ –

চর্যাগীতিকাগুলিতে ব্যবহৃত ভাষায় 'ইআ', 'ইলে' এবং 'অন্তে' যোগ অসমাপিকা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আধুনিক বাংলা ভাষায় 'ইয়া' এবং 'ইলে' যোগ এখনও অসমাপিকা গঠিত হয়। তবে 'অন্তে' যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনের পদ্ধতিটি পরবর্তীকালে সংকুচিত হয়েছে।

'ইআ' যোগে অসমাপিকা গঠন –

দুঃখে সুখেঁ একু করিআ (৩৪)
ভাবাভাব দংদল দলিআ (৩০)

'ইলে' যোগে অসমাপিকা গঠন –

সাঙ্কমত চড়িলে (৫)
মালত পড়িলে (৮)

'অন্তে' যোগে অসমাপিকা গঠন –

এথু বুড়ন্তে (১৬)
নাড়ি বিআরন্তে (২০)

ভাষার দ্ব্যর্থকতা ঃ–

চর্যাপদে ব্যবহৃত ভাষাকে সমালোচক ও তাত্ত্বিকেরা সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধাভাষা নাম দিয়েছেন। আর চর্যাকারদের ব্যবহৃত শব্দগুলিকে বলেছেন সন্ধ্যাশব্দ বা সন্ধাশব্দ। 'শব্দকল্পদ্রুম' গ্রন্থে 'সন্ধ্যা' ও 'সন্ধা' দুটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে। তবে সম্বন্ধও স্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা প্রতিশব্দ এবং উভয়ের সঙ্গে শব্দের যোগ রয়েছে, যা অর্থ মিলন। চর্যার সাধনতত্ত্ব কিংবা বারবার দুই ভিন্নধর্মী বা বিপরীতমুখী বিষয়ের মিলনের কথা বলা হয়েছে। ভাষার মধ্যেও রয়ে গেছে তার ইঙ্গিত। সন্ধ্যা/সন্ধা শব্দের দুটি অর্থের একটি আভিধানিক, অন্যটি আভিপ্রায়িক। প্রথমটি অধিকতর স্পষ্ট ও ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু, দ্বিতীয়টি গূঢ়ার্থবোধক এবং কূটভাব জাতীয়। যা আসলে সংকেতবহ, স্বসংবেদ্য, অচিন্ত্য ও বাকপথাতীত। যার মধ্য দিয়ে সহজমহাসুখ বা সহজানন্দের প্রতীতি দ্যোতিত হয়। 'সন্ধা' শব্দটির সঙ্গে 'সন্ধানম্' শব্দটির সংযোগ অস্বীকার করা যায় না। ফলত, এর মধ্য দিয়ে সন্ধানের দ্যোতনাটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উৎপ্রেক্ষা বা ব্যাজস্তুতি এবং সন্ধ্যাভাষা এক নয়। প্রথম দুটি অলংকার। কোনোপ্রকার সাধনার গূঢ়তত্ত্বের দ্যোতনা বা সংযোগ এদের সঙ্গে নেই। সাহিত্যিক প্রয়োগে এদের ভূমিকা থাকতে পারে, কিন্তু অন্যত্র নয়। তাই বলা যায়, উৎপ্রেক্ষা বা ব্যাজস্তুতি থেকে সন্ধ্যাশব্দের ভূমিকা ভিন্ন এবং গভীর।

বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে গৃহীত শব্দ ঃ –

চর্যায় ব্যবহৃত বহু শব্দে গূঢ়ার্থবোধকতা ও দ্ব্যার্থকতা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সাধকেরা তাঁদের সাধন-বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ কেবলমাত্র প্রকৃত শিষ্যকেই উপলব্ধ করাতেন বা অবগত করাতেন। এ ভিন্ন অন্যত্র এবং অনুশীলন তাদের আদৌ কাম্য ছিল না। কেবলমাত্র নিজস্ববৃত্তেই এর আবর্তন ও অনুবৃত্তি ঘটুক, তাঁরা এটাই চাইতেন। ফলত, এই জাতীয় শব্দের প্রয়োগাধিক্য স্পষ্ট হয়। নিচে এই জাতীয় কিছু শব্দের একট তালিকা দেওয়া হল –

শব্দ	প্রাচীন অর্থ/মূলার্থ	চর্যার্থ
বোধি (৫)	জ্ঞান	মহামুদ্রাসিদ্ধি
জিনপুর (৭)	বুদ্ধপুর	মহাসুখপুর
জিনরঅণ (৪০)	বুদ্ধরত্ন/নির্বাণ	সহজানন্দ
মাঙ্গ (৮)	অষ্টাঙ্গিক মার্গ	অবধূতী মার্গ

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

নিবাণ(৫,২৭)	দুঃখের আত্যন্তিক নিবোধ	প্রভাস্বর
দশবন(৯)	স্বয়ংবুদ্ধ	বুদ্ধে বৈশারদ্যাদি গুণ
তিশরণ(১৩)	বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ	কায়বাকচিত্ত
বুদ্ধ(১৭)	ভগবান বুদ্ধ	বজ্রধর

হিন্দুযোগ ও তন্ত্র শাস্ত্র থেকে গৃহীত শব্দ ঃ—

চর্যার সাধকেরা শুধুমাত্র বৌদ্ধ শাস্ত্র থেকে শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন এমনটা নয়। তাঁরা হিন্দু যোগ এবং তন্ত্র শাস্ত্র থেকেও অনেক শব্দগ্রহণ করেছিলেন। প্রয়োগের ক্ষেত্রে এগুলিরও আভিপ্রায়িক অর্থ-ই তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল। এমন কিছু শব্দের তলিকা নীচে দেওয়া গেল —

শব্দ	**প্রাচীন অর্থ/মূলার্থ/তন্ত্রার্থ**	**চর্যার্থ**
চন্দ্র-সূর্য (৩)	বাম ও দক্ষিণ নাড়ী	বাম ও দক্ষিণ নাড়ী; গ্রাহ্য-গ্রাহক
নাদবিন্দু(৩২, ৪৪)	শক্তি স্পন্দনের প্রকারভেদ	প্রজ্ঞা-উপায় বা গ্রাহ্য-গ্রাহক বিকল্পজ্ঞানের প্রতীক
দশমীদুয়ারে(৩)	পায়ুদ্বার	বৈরোচনদ্বার
মণিমূল(৩)	নাভিকমল	বম্রমণিশিখর

বৌদ্ধতন্ত্র থেকে গৃহীত শব্দ ঃ—

শব্দ	**বৌদ্ধ তন্দ্রার্থ**	**চর্যার্থ**
কমলকুলিশ(৪, ৫৬)	পদ্মবজ্র	প্রজ্ঞা উপায়
জোইনি(৪, ১৮)	যোগিনী	জ্ঞানমুদ্রা
কামরু(২)	পীঠস্থান	মহাসুখচক্র

লোকজীবনাগত শব্দ ঃ—

যোগ, তন্ত্র এবং নানা শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়াও সমকালীন লোকজীবন থেকে বহু শব্দ চর্যায় গৃহীত হয়েছে। এই শব্দগুলি সাধারণত খুবই সুপরিচিত এবং বহুল প্রচলিত। কিন্তু এই শব্দগুলির চর্যায় কাম্য অর্থ ভিন্ন ছিল। নিচে এমন কিছু শব্দের উল্লেখ করা হল —

শব্দ	**লৌকিক অর্থ**	**চর্যার্থ**
শুণ্ডিনী(৩)	শুঁড়িনী	অবধূতিকা/অবধূতী
খড়ুলী(৩)	মরুমুখ ঘড়া	শুক্রনাড়ি
কমলরস(৪)	পদ্মমধু	বোধিচিত্ত
রূপা(৮)	রৌপ্যধাতু	রূপ-আদি বিষয়
খুনি□(৮)	খুঁটি	আভাষদোষ
কাচ্ছি(৮)	রজ্জু/মোটা দড়ি	অবিদ্যা সূত্র
কেড়ুআল(৮)	নৌকার হাল/দাঁড়	সদগুরু বচন
নগর(১০)	পুরী	রূপাদি বিষয়
তান্তি(১০)	বাঁশের তন্ত্রী	অবিদ্যা (ভগ বা পদ্মস্থান)
সাসু(১১)	শ্বশুর/শাশুড়ী	শ্বাস
মাঅ(১১)	মাতা	মায়া/অবিদ্যা
গঅবর(১২)	দাবার বাজ	তথতাচিত্ত
ঠাকুর(১২)	দাবার রাজা	অবিদ্যা চিত্ত
মতি(১১)	দাবার মন্ত্রী	প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধি
বড়িলী মাতঙ্গী(১৪)	বুড়ী মাতঙ্গীকন্যা	প্রমত্ত নৈরাত্মা
সিকল(১৬)	শৃঙ্খল	সংসার পাশ
খম্ভা(১৬)	থাম	অবিদ্যা
বিসমা(১৭)	বিষম	নির্বাণ
বিবাহ(১৯)	পরিণয়	বায়ুরূপ গমনদ্বারের বাধাভঙ্গ
নিরাসী(২০)	নিরাশ	আসঙ্গরহিতা
বাপুড়া(২০)	হতভাগ্য	বাসনাহীন
কমলিনী(২৭)	পদ্মিনী	পরিশুদ্ধ অবধূতী বা নৈরাত্মা
সবর-সবরী(২৮)	শবর জাতীয় নরনারী	বজ্রধর ও জ্ঞানমুদ্রা
গুঞ্জামালী(১৮)	গুঞ্জমালা	গুহ্যমন্ত্র
দারী(২৮)	পত্নী	নৈরামণি
তিঅধাউ(২৮)	ত্রিধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র)	কায়চিত্ত
বঙ্গ(৩৯)	বঙ্গদেশ	অদ্বয়জ্ঞান
জোহ্নবাটিকা	জ্যোৎস্নাবাড়ি	জ্ঞানেন্দুমণ্ডল

একটি বিশেষ বর্ণাশ্রয়ী শব্দ ঃ—

চর্যায় বেশ কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলি একটি বিশেষ বর্ণকে আশ্রয় করে তৈরি। মূলার্থ বিচারের ক্ষেত্রে বর্ণগুলির ভূমিকা স্পষ্ট। তবে চর্যার্থের ব্যঞ্জনা ভিন্ন মাত্রা প্রকাশ করে। যেমন —

শব্দ	আশ্রয়ীবর্ণ ও মূলার্থ	চর্যার্থ
আলি (৭, ১১)	অ-কারাদি স্বরবর্ণমালা	আলোকজ্ঞান (চন্দ্র)
কালি (৭, ১১)	ক-কারাদি ব্যঞ্জনমালা	আলোকভাম (সূর্য)
সারি (১৭)	গীতবিশেষ	অ-অক্ষরের স্বরূপবোধক গান বা শূন্যতার স্বরূপবোধক গান
কপাস (৫০)	কাপাস বা তুলা; ক ও খ (ক-সংবৃত্তি সুখ) (খ-শূন্যতা মুখ)	ক-কারের পাশ্ববর্তী খ-কার, অর্থাৎ সংবৃত্তিসুখের পাশে শূন্যতা সুখ
কপালী (১০)	কাপালিক; ক (ক-কে পালন করেন যিনি)	ক-রূপ সংবৃত্তি সুখ পালনে সমর্থ চর্যাধর
কঙ্গুচিনা (৫০)	চিনা শস্যদানা; ক (ক যাঁর অঙ্গচিহ্ন)	ক-রূপসংবৃত্তি সুখ যাঁর অঙ্গচিহ্ন অর্থাৎ বজ্রধর
কুল (১৪, ১৫, ৩৮)	বংশ ; ক	কু লয় প্রাপ্ত হয়েছে যেখানে
খমণ ভাতারী (২০)	(কু=শরীর লয় প্রাপ্ত) ঢ্যামনা স্বামী যার; খ	(শরীর এবং মার্গ উভয় লয়) খ (=সর্বশূন্য) যার মনঃস্বামী
খট্ট (১১), খাট (২৮)	খাট; খ ও ট	
সবর (২৮)	(খ = শূন্যতা) (ট = নাড়ি শক্তি) শবর ; স (স-এর পাশে অবস্থিত)	শূন্যতা নাড়িশক্তি প্রভাস্বর কর্তৃক টালিত বা স্পৃষ্ট বজ্রধর

চর্যাসাধকেরা এমন কিছু সন্ধ্যাশব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলি লৌকিক জীবনে নরনারীর দেহমিলন ক্রিয়াকে স্পষ্ট দ্যোতিত করে। যেমন, কর্পূরক (=শুক্র), সিহ্লুক (=স্ত্রীরজ), তিঅড্ডা (=ত্রিভুজাকৃতি ভগ বা স্ত্রী যৌনাঙ্গ), কমলরস (=মুখপদ্মমধু), অঙ্গবালী (=আলিঙ্গণ) প্রভৃতি। ফলত, অনেক সমালোচক সন্ধ্যাভাষাকে অশ্লীল বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, চর্যার সাধক ও যোগিনীদের আচার আচরণ কুৎসিত ও রুচিগর্হিত এবং সামাজিক সংসারবোধশূন্য। হয়তো একারণে এর অনুশীলন বহুসংখ্যক সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়নি।

চর্যার রাগরাগিনী ঃ—

চর্যাগুলি মূলত গীতধর্মী। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে প্রতিটি চর্যার সূচনায় রাগের উল্লেখ রয়েছে। সঙ্গীতের দুটি অঙ্গ — ধাতু (রাগাদি অবয়ব) ও মাতু (তালাদি অবয়ব)। আর এতে ব্যবহার হয় দু'টি পুংরাগ এবং ছত্রিশটি স্ত্রীরাগিনী। চর্যায় মূলত স্ত্রীরাগিনীগুলির ব্যবহার। কোন্ চর্যায় কোন্ রাগিনীর ব্যবহার নীচে তার একটা তালিকা দেওয়া হল —

পটমঞ্জরী (১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬ = ১১টি)
গবড়া (২, ৩)
গউড়া (১৮)
অরু (৪)
গুর্জরী/গুঞ্জরী (৫, ২২, ৪৭)
দেবক্রী (৮)
দেশাখ (১০, ৩২)
ভৈরবী (১২, ১৬, ১৯, ৩৮)
কামোদ (১৩, ২৭, ৩৭, ৪২)
রামক্রী (১৫, ৫০)
বরাড়ী (২১, ২৩, ৩৪)
বলাড্ডী (২৮)
ধানসী (১৪)
মল্লারী (৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫, ৪৯)
শবরী (৪৬)
শীবরি (২৬)
বঙ্গাল (৪৩)
মালসী-গউড়া (৪০)
কহু-গুঞ্জরী (৪১)

চর্যার ছন্দ প্রকরণ ঃ—

চর্যায় মূলত তিন প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ক) পাদাকুলক বা পয়ার খ) ছাব্বিশ মাত্রার ত্রিপদী এবং গ) চব্বিশ মাত্রার দোহা জাতীয় ছন্দ। পয়ারের ক্ষেত্রে ১৪/১৬/১৮ মাত্রার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন,

নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ
(১০) – ১৪ মাত্রা
তহি বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ লীঁলেঁ পার
করেই (১৪) – ১৮ মাত্রা

লঘু ত্রিপদী —

সুনা পান্তর উহন দিসই ভান্তি ন বাসসি
জাংতে। (১৪) – ২০ মাত্রা (৬+৬+৮)

দীর্ঘ ত্রিপদী —

রাউতু ভণই কটভুসুকু ভণই কট
সঅলা অইস সহাব। (৪১) – ২৬ মাত্রা
(৮+৮+১০)

পয়ারের ক্ষেত্রে পজ্‌ঝড়ি ও অড়িল্লার

ব্যবহারও অনেক ক্ষে ত্র দেখা যায়। পজ্ঝ ড়িতে চারটি চারমাত্রার চতুষ্ক ব্যবহৃত হয়। অড়িল্লাতে ১৫ মাত্রার ব্যবহার হয়। যেমন, করুণা পিহাড়ী খেলহু নঅবল। এখানে 'না' তে দুই মাত্রা, 'হ্যাঁ'তে দুইমাত্রা গণনা করাহয়েছে। ১৬, ১৮ এবং ৩৪ চর্যায় ছাব্বিশ মাত্রার দোহাছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কমণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর সে সঅ মন্ডল সএল ভাজই।।
(১৬)

কয়েকটি চর্যায় ছন্দের ক্ষেত্রে মিশ্ররীতির ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

চালিঅ ষযহর মাগে অবধুই।
রঅণহু ষহজে কহেই।।
(২৭) – পাদাকুলক ও রসিকা

উল্লালা ও দোহার মিশ্র ব্যবহার পাওয়া যায় চর্যা নং ১৪-তে।

বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু পাঅ পএঁ জাইব দুনু জিন উরা।।

চর্যার পদকর্তা ও তিব্বতের ৮৪ সিদ্ধাচার্যঃ—

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাগীতিকায় মোট ৫০টি পদ থাকলেও পাওয়া গিয়েছিল ৪৬টি পূর্ণ পদ ও একটি খণ্ডিত পদ। পাওয়া যায়নি ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদ। ২৩ নং চর্যাটি খন্ডিত ছিল। মোট পদকর্তার সংখ্যা হল ২৩। পদ-অনুসারে তার একটি তালিকা দেওয়া গেল—

লুই—১, ২৯
কুক্কুরী—২, ২০, ৪৮ (লুপ্ত)
বিরুআ—৩
গুডরী—৪
চাটিল—৫
ভুসুকু — ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯
কাহ্ন — ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪ (লুপ্ত), ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫
কামলি—৮
ডোম্বী—১৪
শান্তি—১৫, ২৬
মহিন্ডা—১৬
বীণা—১৭
শবর—২৮
আজদেব—৩১
ঢেন্ঢন—৩৩
দারিক—৩৪
ভাদে—৩৫
তাড়ক—৩৭
সরহ—২২, ৩২, ৩৮, ৩৯
কঙ্কণ—৪৪
তান্তি—২৫ (লুপ্ত)
জয়নন্দি—৪৬
ধাম—৪৭

তিব্বতের প্রাচীন ইতিহাসে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই তালিকায় ২০ জন চর্যাকারেও নাম রয়েছে। যে তিনজনের নামোল্লেখ নেই তাঁরা হলেন — চাটিল, তাড়ক এবং ঢেন্ঢন। মিথিলার পন্ডিত জ্যোতিরিশ্বর ঠাকুর 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থে ৭৬ জন সিদ্ধাচার্যের একটি তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকায় নয়জন চর্যাকেরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এরা হলেন – তান্তি, দারি, বিরুপা, কাহ্ন, ভাদে, কামরি (কামলি), সবর (শবর), সান্তি (শান্তি), চাটর (চাটিল)। পন্ডিত প্রবর রাহুল সংস্কৃত্যায়ণের'দোহাকোষ'-এর ভূমিকায় সিদ্ধাচার্যদের একটি তালিকা রয়েছে। এতে কেবলমাত্র তাড়ক ও ঢেন্ঢন ছাড়া বাকি ২১ জন চর্যাকারের নাম উল্লিখিত রয়েছে। তিব্বতের চুরাশি সিদ্ধাচার্যের তালিকা নীচে দেওয়া হল—

১. লুইপা (মৎস্যান্দ্রাদ)
২. লীলাপা
৩. বিরুপা
৪. ডোম্বী-হেরুক
৫. শবর (শবরী)

৬ . সরহ (রাহুল ভদ্র)
৭ . কঙ্কালি
৮ . মীন (বজ্রপাদ)
৯ . গোরক্ষ
১০ . চৌরঙ্গী
১১ . বীণা
১২ . শান্তি (রত্নাকর শান্তি)
১৩ . তান্তি
১৪ . চর্মরি
১৫ . খড়্গা
১৬ . নাগার্জুন
১৭ . কৃষ্ণচারী (কাহ্নপাদ)
১৮ . কাণের (আর্যদেব)
১৯ . স্থপণ
২০ . নাড়পা
২১ . মালিপা
২২ . তিলোপা
২৩ . ছত্র
২৪ . ভদ্র (ভাদে)
২৫ . দ্বিখন্ডী
২৬ . অযোগী
২৭ . কড়পাদ
২৮ . ধোবী
২৯ . কঙ্কণ
৩০ . কম্বল (কামরি)
৩১ . ঢেঙ্কি
৩২. ভদে (ভান্ডারী)
৩৩ . তন্ধী
৩৪ . কুক্কুরী
৩৫ . কুব্জী
৩৬ . ধর্ম (ধাম)
৩৭ . মহী
৩৮ . অচিন্ত্য
৩৯ . বভহী
৪০ . নলিন
৪১ . ভুসুকু (শান্তিদেব)
৪২. ইন্দ্রভূতি
৪৩ . মেঘপাদ
৪৪ . কুঠালি
৪৫ . কর্মার
৪৬ . জালন্ধারী
৪৭ . রাহুল
৪৮ . সর্বরি
৪৯ . ধোকরী
৫০ . মেদিনী
৫১ . পঙ্কজ
৫২.ঘন□
৫৩ . যোগী
৫৪ . চেলুক
৫৫ . গুন্ডরী
৫৬ . লুঞ্চক
৫৭ . নির্গুণ
৫৮ . জয়ানন্দ (জয়নন্দি)
৫৯ . চর্যটি
৬০ . চম্পক
৬১ . বিষাণ
৬২. ভলি
৬৩ . কুমরী
৬৪ . চর্পটি
৬৫ . মণিভদ্র
৬৬ . মেঘলা
৬৭ . মঞ্ঝলা
৬৮ . কলকল
৬৯ . কন্তরি
৭০ . ধহুলি
৭১ . উধলি
৭২. কপালী
৭৩ . কিল
৭৪ . পুষ্কর
৭৫ . সর্বভক্ষ

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

৭৬. নাগবোধি
৭৭. দারিক
৭৮. পুত্তল
৭৯. পনহ
৮০. কোকিলা
৮১. অনঙ্গ
৮২. লক্ষ্মীঙ্করা
৮৩. সামুদ্র
৮৪. ভলিপা (ব্যাড়ি)

চর্যার সাধনা দীর্ঘদিন লুপ্ত হয়েছে। খ্রিঃ দ্বাদশ শতকের পরে তেমন কোনো পরিচয় ইতিহাসে স্পষ্ট নয়। কিন্তু এই ধারার অনুশীলন প্রচ্ছন্নভাবে প্রবহমান ছিল। এর প্রমাণ পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে মেলে। বৈষ্ণবসাধকদের মরমিয়া সাধনায় চর্যার অনুবর্তন দুর্লক্ষ্য নেই। ধর্মঠাকুরের গাজনের গানেও চর্যার অনুরণন শোনা যায়। সেক শুভোদয়াতে মূলত ডাকিনীগীতিকার মধ্যে বজ্রগীতির স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর কীর্তন গানের সঙ্গে চর্যার গানগুলির সাদৃশ্য সহজেই অনুভব করা যেতে পারে। চর্যাসাধকেরা চর্যাগীতি বা বজ্রগীতি গেয়ে হেরুক বা হেবজ্রের সাধনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের কিছু গানের চর্যার স্পষ্ট অনুরণন লক্ষ করা যায়। যথা,

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়,
তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারায়েছি
আমি পেয়েছি আঁধার রাতে।

নাথপন্থী ও গোরক্ষপন্থী সাধনায় চর্যাগীতিকার অনুসরণ দেখা যায়। এঁদের গানেও চন্দ্র-সূর্য, গঙ্গা-যমুনা, দেহ নগরী ইত্যাদি রূপকের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। আধুনিক কালেও চর্যার অনুবর্তন-অনুসৃজন বাংলা সাহিত্যে অলক্ষ্য নেই। এ যুগের কবি ও কথাকারেরা নানাভাবে চর্যার গানগুলিকে নবনির্মাণের সূত্রে বারবার ব্যবহার করছেন তাঁদের রচনায়। যেমন, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চর্যাপদের হরিণী' (গল্প সংকলন), সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' (উপন্যাস) উল্লেখযোগ্য। এ তালিকা দীর্ঘ করা নিষ্প্রয়োজন। তাই আমরা অবলীলায় বলতে পারি, হাজার বছর পরে আজও এই গানগুলির প্রাসঙ্গিকতা এতটুকুও হারিয়ে যায়নি। চর্যার গানগুলি ভাবে ও ভাষায় বাঙালি জীবনের একটা বিশেষ কালপর্বের সনিষ্ঠ পরিচয় বহন করে। যা শুধু ভাষা লক্ষন নয়, সে সময়ের সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষিতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই চর্যাকারদের রচনার সার্থকতা। গূঢ় সাধন-প্রসঙ্গের বাইরেও সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে তা তুলে ধরে এক অমিয় আবেদন। আর তা-ই চর্যার গানগুলিকে করে তুলেছে ক্ষুদ্র সময়ের গণ্ডী অতিক্রম করে চিরকালীন।

গ্রন্থঋণ ঃ—

১। চর্যাগীতি পদাবলী ঃ সুকুমার সেন, ১৯৫৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
২।চর্য্যাপদঃ মণীন্দ্রমোহন বসু, ২০১০, বামা, কলকাতা।
৩। বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি ঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৩৭৬ বঃ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।
৪। চর্যাগীতির ভূমিকা ঃ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ১৩৮২ বঃ, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।
৫। Dohakosa (Part-I) ঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, কলকাতা সংস্কৃত সিরিজ, কলকাতা।
৬।দোহাকোষ ঃ রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ, ১৯৫৭, বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ, পাটনা।
৭। The Old Bengali Language and Text ঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৩, কলকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
৮।বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খন্ড) ঃ ১৯৯৬, সাহিত্য অকাদেমী, নতুন দিল্লী।